বেঙ্গল টাইমস

১ মে, ২০২৬

বাঙালির উভয় সংকট

bengaltimes.in ISSN 2445 5657

সম্পাদকীয়

উভয় সংকট

বাঙালির সামনে সত্যিই এক উভয় সংকট। সে কোন পথে হাঁটবে? স্থিতাবস্থা নাকি পরিবর্তন? যেমন চলছে, তেমনই চলুক? নাকি পাল্টে দিয়ে নতুন কাউকে আনা? কোনও সন্দেহ নেই, সরকার বিরোধী একটা হাওয়া আছে। গ্রামগঞ্জ থেকে শহরতলি, সর্বত্রই একটা চোরাস্রোত। কিন্তু এমন হাওয়া তো পাঁচ বছর আগেও ছিল। সবাই ধরেই নিয়েছিলেন, বিজেপি এবার আসছেই। কিন্তু একশোর আগেই দৌড় থেমে গিয়েছিল।

এবার কী হবে? বুথফেরত সমীক্ষায় পাল্লা বিজেপির দিকেই ঝুঁকে। এবারের ভোট অন্যান্যবারের তুলনায় অনেকটাই শান্তিপূর্ণ। তেমন সন্ত্রাসের আবহ ছিল না। এর জন্য নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য। মানুষ নির্ভয়ে নিজের ভোট দিতে পেরেছেন। এবারের ভোটে ফল যাই হোক, মানুষের রায় বলে মেনে নিতে কোনও দ্বিধা থাকার কথা নয়।

শাসকদলের বিপক্ষে যদি হাওয়া থাকে, তবে পক্ষেও অনেককিছুই আছে। যেমন, যে কোনও কারণেই হোক, সংখ্যালঘু ভোটের বড় অংশ এখনও তৃণমূলের দিকেই ঝুঁকে আছে। যতটা না তৃণমূলকে ভালবেসে, তার থেকে বেশি

বিজেপির প্রতি অনাস্থায়। এই অনাস্থার পরিবেশ তৈরি করার জন্য মোদি, অমিত শাহদের উস্কানিমূলক ভাষণের অবদান কম নয়। অন্যদিকে, মহিলা ভোটের বড় অংশও তৃণমূলের দিকে। নানা সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অনেকেই উপকৃত। অতীতেও তার সুফল তৃণমূল পেয়েছে। এবার বিজেপি পাল্টা অন্নপূর্ণ যোজনার আশ্বাস দিয়েছে। সেই আশ্বাস মহিলাদের কাছে কতটা বিশ্বাসযোগ্য হয়, সেটাও দেখার।

অন্যদিকে, যুব সমাজের বড় অংশের ভোট শাসকদলের বিরুদ্ধেই যাওয়ার ইঙ্গিত। পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোটও হয়তো বিজেপির দিকেই ঝুঁকবে। ছাত্র, চাকরিজীবী মানুষের বড় অংশের সমর্থনও হয়তো বিজেপির দিকেই। অনেক বাম মনস্ক মানুষের আশঙ্কা, বামেদের ভোট দিলে হয়তো তৃণমূল জিতে যেতে পারে। তাই তৃণমূলের হার নিশ্চিত করা বেশি জরুরি। সেই যুক্তিতে তাঁদের ভোট বিজেপির দিকে আগেও গেছে, এবারও যাবে।

দাঁড়িপাল্লার লড়াই। একদিকে লাগাতার সন্ত্রাস, দমবন্ধ করা পরিবেশ, সীমাহীন দুর্নীতি। অন্যদিকে, ধর্মের জিগির তুলে সারাক্ষণ পরিস্থিতি অশান্ত রাখা। বাঙালির হয়েছে উভয় সংকট— শ্যাম রাখি না কুল রাখি। পনেরো বছর আগে বাঙালি একবার 'পরিবর্তন চাই' য়ের স্রোতে ভেসেছিল। কদিন যেতে না যেতেই 'পরিত্রাণ চাই' বলে মুক্তি খুঁজেছিল। এবারও যদি পরিবর্তনের ঝড় ওঠে, তা কতটা সুখকর হবে, তার উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভেই লুকিয়ে আছে।

স্থিতাবস্থা নাকি পরিবর্তন? বাঙালির উভয় সংকট

রক্তিম মিত্র

আমি পড়েছি উভয় সংকটে। একদল বলছে, পরিবর্তন চাই। এই সরকারকে আর নেওয়া যাচ্ছে না। আবার আরেক দল বলছে, আর যাই হোক এই রাজ্যে বিজেপিকে ডেকে আনার কোনও মানে হয় না। রাজ্যের পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।

আমি কোন দলে? আমি উভয় দলে। এটাই সংকটের সবথেকে বড় কারণ। আমিও মনে করি, গত ১৫ বছরে তৃণমূল যা যা অনাচার করেছে, কঠোর শাস্তি তাদের প্রাপ্য। কেন্দ্রীয় তদন্তে বা আইনের আঙিনায় এই শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আইন যেটা পারেনি, সেটা অন্তত জনতা দিক। অন্তত ক্ষমতা থেকে তাদের নির্বাসন হোক। সেটাকেই না হয় বড় শাস্তি বলে ধরে নেব। ভবিষ্যতের শাসকদের কাছে অন্তত এই বার্তাটুকু পৌঁছোক, জনতা জনার্দন ঠিক দেখছে। আইন, প্রশাসন, মিডিয়া চোখ বুজে থাকলেও জনতার চোখ ঠিক খোলা আছে। আবার অন্য একটা আশঙ্কাও আছে। মানুষ যখন একটা সরকারকে প্রত্যাখ্যান করে, পাশাপাশি অন্য একটা সরকারকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়েও আসে। ঠিক যেমন ২০১১ সালে, মানুষ বামফ্রন্টকে প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি এটাও বিলক্ষণ জানত যে, বামফ্রন্ট সরে যাওয়া মানে তৃণমূলের আগমন। ঠিক তেমনই, এবার তৃণমূল সরে যাওয়া মানে বিজেপির আগমন। তৃণমূল যেমন পরীক্ষিত, এই রাজ্যের ক্ষেত্রে বিজেপি মোটেই তেমন পরীক্ষিত নয়। আশাবাদী মন ভাবতেই পারে, কত আর খারাপ হবে? আগে তৃণমূল তো যাক। তারপর না হয় বুঝে নেওয়া যাবে। তেমন খারাপ কিছু করলে তাদেরও না হয় সরিয়ে দেওয়া যাবে।

কিন্তু বাঙালি জাতিটা বড়ই সহনশীল। সে যাকে একবার আনে, তাকে সহজে ছাড়তে চায় না। প্রায় ৩০ বছর ধরে কংগ্রেসকে সহ্য করেছে। পরের ৩৪ বছর বামেদের সহ্য করেছে। তিনটে টার্ম ধরে তৃণমূলকেও

সহ্য করছে। তাই একবার যদি বিজেপি এসেও যায়, যতই অনাচার করুক, এত সহজে বাঙালি তাদের ছুঁড়ে ফেলবে না। তাদেরও পর্যাপ্ত সময়ই দেবে। অর্থাৎ, বামেরা যতই 'আগে রাম পরে বাম' বলে উল্লাসিত হোন, এই রাম পর্বের মোহ কাটতে অনেক সময় লাগবে।

বিজেপি আমাদের রাজ্যে তেমন পরীক্ষিত নয় ঠিকই, কিন্তু কেন্দ্রে যথেষ্টই পরিক্ষিত। সেখানে মোদি বাবুর দেখতে দেখতে এক যুগ, অর্থাৎ ১২ বছর কেটে গেল। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে যা যা বলেছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে তার এক শতাংশও পূরণ করতে পারেননি। যেমন কর্মসংস্থানের কথাই ধরা যাক। সদর্প ঘোষণা ছিল, বছরে দু কোটি মানুষের চাকরি হবে। ১২ বছরে সেটা ২৪ কোটি হওয়ার কথা। ২৪ কোটির জায়গায় যদি ২৪ লাখও হতো, তাহলেও বলা যেত, অন্তত এক শতাংশের হয়েছে। কিন্তু চব্বিশ লাখেরও হিসেব দেখাতে পারছে না কেন্দ্র। অর্থাৎ নিয়োগ এক শতাংশও নয়। আরও একটি ঘোষণা ছিল, একশোটি স্মার্ট সিটি তৈরি হবে। ১২ বছরে একশোটি তো দূরের কথা, একটি শহরের নামও বলা কঠিন। ঘোষণা ছিল, বিদেশে গচ্ছিত সমস্ত কালো টাকা ফিরিয়ে আনা হবে। এই নিয়ে এখন আর কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায় না।

এই যদি মোদি বাবুর ট্র্যাক রেকর্ড হয়ে থাকে, তাহলে তাঁকেই বা কতখানি ভরসা করা যায়? এই রাজ্যে ভোটের আগে তিনি

ঘোষণা করে বসলেন, মহিলাদের মাসে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। শুনতে বেশ ভালই লাগে। বিশ্বাস করার লোকের অভাবও নেই। কিন্তু ঘটনা হল, এই মুহূর্তে কুড়িটি রাজ্যে বিজেপি ও তার জোট সঙ্গীরা শাসন ক্ষমতায়। কটি রাজ্যে এই প্রকল্প চলছে? উত্তর হল, একটিও না। তাহলেই বুঝুন। যারা একটি রাজ্যেও তথাকথিত অন্নপূর্ণা যোজনা চালু করতে পারেনি, তারা পশ্চিমবঙ্গে চালু করবে!

আরেক জুমলা। পদে পদে এমন কত জুমলা যে হজম করতে হবে, তা কেউ জানে না। কোন কাজ হল আর কোন কাজ হল না, তা নিয়ে কেউ কৈফিয়ত চাইবে না। যখনই আপনার মনে প্রশ্ন জাগবে, তখনই হয় পাকিস্তানের নাম করে অথবা হিন্দু-মুসলিমের নাম করে আপনার মগজ ধোলাই ঠিক হয়ে যাবে। রাজ্য ঋণে জর্জরিত, শিল্প নেই, কর্ম সংস্থান নেই, সীমাহীন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি। অথচ, এগুলোকে ছাপিয়ে প্রচারে আসছে বাংলাদেশ, রোহিঙ্গা, অনুপ্রবেশ, মুসলিম জঙ্গি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যাঁদের রুচি, এই যাঁদের অগ্রাধিকার, তাঁদের আহ্বান করে ডেকে আনা খাল কেটে কুমীর ডেকে আনার মতো হবে না তো!

এরপর কোনটা চাওয়া যায় বলুন তো? পরিবর্তন? নাকি স্থিতাবস্থা? যারা ফেসবুকে আচ্ছন্ন, তারা ভেবে বসে আছেন, বামেরা হয়তো ক্ষমতায় এসে যাবে। যদি কয়েকটা কম পড়ে, তাহলে কংগ্রেস আছে। কিন্তু এতখানি অবাস্তব স্বপ্নই বা দেখি কীভাবে? যেটা এই মুহূর্তে হওয়ার নয়, সেটা নিয়ে স্বপ্ন দেখতে গেলে অচিরেই ঘুম চটকে যাবে। অতএব দ্বিধা, দ্বিধা, এবং দ্বিধা। অন্ধকার সরণির শেষে কোথাও কোনও আলোর দেখা নেই।

গ্রামীণ ভূতের ভোট দেওয়ার অনেক ঝক্কি

ধীমান সাহা

ভোটের আবেগ সবাইকে সেভাবে তাড়া করে না। কেউ কেউ আছেন চাকরিসূত্রে অনেক দূরে থাকেন, কিন্তু ভোটের দিন ঠিক হাজির হয়ে যান। আবার উল্টোটাও আছে। কাছাকাছি থাকেন, চাইলেই দিতে পারতেন। কিন্তু ভোট দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না।

কিন্তু এবার ভোট পড়ল ৯২ শতাংশ। নিশ্চিতভাবেই এই অঙ্কটা চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতোই। এত ভোট পড়ার পেছনে যুক্তিটা কী? যে যার মত করে ব্যাখ্যা করবেন। অনেকে বলছেন, এটা এস আই আর এর এফেক্ট। এবার নাম উঠে গেলেও আগামী দিনের নাম বাদ যেতে পারে, এই আশঙ্কায় নাকি

অনেকে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন। কথাটা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। প্রত্যেকেই নিজের নিজের বুথে এমন এমন মানুষকে ভোট দিতে দেখেছেন, যাঁদের হয়তো গত পনেরো বা কুড়ি বছরে ভোট দিতে দেখা যায়নি। এবার শুধু তাঁরাই আসেননি, পরিবারের লোকদেরও সঙ্গে করে এনেছেন।

পাশাপাশি অন্য একটা ব্যাখ্যাও আছে। ধরা যাক, কোনও একটি বুথের ভোটার সংখ্যা ৭০০। হয়তো ভোট পড়তো সাড়ে পাঁচশোর কাছাকাছি। অঙ্কের হিসেবে প্রায় ৮০ শতাংশ। অনেক মৃত ভোটারের নাম তালিকায় থেকে গিয়েছিল। অনেকের হয়তো বিয়ে হয়ে গেছে, তবু তালিকায় নাম থেকে গেছে। কিন্তু ভোট দিতেও আসেন না। অনেকে কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। সেখানেও নাম উঠেছে। ফলে গ্রামের বাড়িতে আর আলাদা করে ভোট দিতে আসেন না।

এবার এস আই আর এর কারণে ধরা যাক সেই বুথ থেকে ১০০ জনের নাম বাদ পড়ল। অর্থাৎ ভোটার সংখ্যা দাঁড়ালো ৬০০র কাছাকাছি। এবারও ভোট পড়ল আগের মতোই, অর্থাৎ সাড়ে পাঁচশোর কাছাকাছি। অর্থাৎ যাঁরা আগেরবার দিয়েছিলেন, এবারও তাঁরাই দিলেন। কিছু নতুন নাম ও হয়তো যুক্ত হয়েছে। কিন্তু শতাংশের হিসেবে ৯০ শতাংশ ছাপিয়ে গেল।

কোথাও কোথাও হয়তো মৃত মানুষেরা অশরীরী আত্মা হয়ে ভোট দিয়ে যেতেন। যাঁরা নেই, তাঁদের ভোট অনেক সময় পড়ে যেত। কারণ এই সমাজে সমাজসেবকের অভাব নেই। সচরাচর শাসকদলের কর্মীরাই এই সমাজ সেবকের ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এটা শহুরে ভোটের ক্ষেত্রে যতটা সহজ, গ্রাম্য ভোটের ক্ষেত্রে ততটা নয়। কারণ, সেখানে সবাই সবাইকে চেনেন। আপনার নামে অন্য কেউ ভোট দিতে এলে অন্য দলের এজেন্টরা সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। তাই মৃত ভোটারের ভোট কোথায় বেশি পড়েছে, এমন সমীক্ষা যদি করা যায়, তাহলে দেখা যাবে শহুরে মৃতদের মধ্যে ভোট দেওয়ার প্রবণতা বেশি। গ্রাম্য মৃতদের ভোট দেওয়ার অনেক ঝক্কি। কেউ না কেউ ঠিক চিনে ফেলে। তখন সেই ‘সমাজ সেবক’ এর কাজটা বড্ড কঠিন হয়ে যায়। তখন শুধু ফাঁকি দিলেই হয় না। একটু ভয়ও দেখাতে হয়। মোদ্দা কথা, সন্ত্রাসের আবহ না থাকলে গ্রামের দিকে মৃত মানুষের পক্ষে ভোট দেওয়া কার্যত অসম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের নামে ভোট পড়েনি।

তাহলে মোদ্দা কথাটা কী দাঁড়ালো? যাঁরা ভোট দিচ্ছিলেন, তাঁরাই দিলেন। শুধু কিছু মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারের নাম বাদ পড়ল। আর তাতেই আশি শতাংশ থেকে বেড়ে নব্বই শতাংশ হয়ে গেল।

সন্ত্রাসের কাহিনি এবার বদলে দিল বাহিনী

অজয় কুমার

এমন ভোট শেষ কবে দেখেছেন? কেউ কেউ স্মৃতি হাতড়ে ২০১১ সালের কথা বলবেন। কিন্তু তারপর থেকে, অর্থাৎ গত ১৫ বছরে এমন ভোট সত্যিই দেখা যায়নি। বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই রাজ্যের মানুষ ভোট বলতে যে হিংসা ও সন্ত্রাসের সঙ্গে পরিচিত, তার সঙ্গে এবারের ছবি অনেকটাই আলাদা। এত বড় রাজ্য, এতগুলো জেলা, এত হাজার হাজার বুথ, তার ওপর গত কয়েক বছরের ভোট লুঠের ট্র্যাডিশন। ফলে বিক্ষিপ্ত হিংসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু যে অশান্তি

ও হিংসার আশঙ্কা ছিল, তাকে অমূলক প্রমাণ করতে পেরেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এর জন্য তাঁদের কুর্নিশ।

ধন্যবাদ দিতে হবে নির্বাচন কমিশনকেও। অন্তত পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁরা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। উৎসবের মেজাজে হয়তো ভোট হয়নি, চারিদিকে একটা থমথমে আবহ হয়তো ছিল। হয়তো পরিস্থিতির সাপেক্ষে সেটা দরকারও ছিল। নির্বাচনে হিংসা ও অশান্তি হলে তার সমালোচনা যেমন নির্বাচন কমিশনের প্রাপ্য, তেমনই শান্তিপূর্ণ ভোট হলে তার কৃতিত্ব থেকে তাদের বঞ্চিত করা উচিত নয়।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ নিজের ভোট নিজে দিতে পেরেছেন। বিভিন্ন এলাকায় এমন কত মানুষ আছেন যাঁরা গত ১৫ বছরে নিজের ভোটটা নিজে দিতেই পারেননি। এই অনিবার্য পরিণতি তাঁদের মেনে নিতে হয়েছিল। এবার অন্তত নির্বাচন কমিশন এমন একটা পরিমণ্ডল তৈরি করতে পেরেছে, যে কারণে এই মানুষগুলো ভোটের লাইনে দাঁড়াতে সাহস পেয়েছেন। দূরদূরান্ত থেকে অনেকে এসেছেন নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে। ভোটদানের শতাংশ যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে ভোটের সংখ্যাও। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা ভোট বানচাল করে আসছিলেন, তাঁদের শুরুতেই দেওয়া হয়েছে কড়া বার্তা। ফলে ভোটের দিন সেই বীরপুরুষদের তেমন সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। তারপরও যাঁরা পুরনো প্রতিভা মেলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরাও দ্রুত বুঝেছেন, এবার তেমন সুবিধে করা যাবে না। ফলে রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া তাঁদের সামনেও কিছু করার ছিল না। এই কারণেও নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে হবে।

অথচ, এস আই আর পর্বে এই নির্বাচন কমিশনকে মোটেই সফল বলা যাবে না। অনেক নাম বাদ পড়েছে ঠিকই। যাঁরা মৃত, যাঁরা স্থানান্তরিত, যাঁদের একাধিক জায়গায় নাম, এই নামগুলো বাদ পড়বে, সেটা স্বাভাবিক। এবং এইসব নাম বাদ দেওয়ার কাজটা খুব একটা কঠিনও ছিল না। একটা রুটিন সরকারি পদ্ধতি মেনে চললেই মসৃণভাবে এই কাজটা সম্পন্ন করা যেত। কিন্তু একদিকে বিজেপির হুঙ্কার, সেই হুঙ্কারে মিশে আছে সাম্প্রদায়িক ইন্ধন, অন্যদিকে শাসকদলের অহেতুক জটিলতা তৈরি করার চেষ্টা। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কিছুটা জটিল হয়ে গিয়েছিল। এই জটিলতাকে কাটাতে যে বিচক্ষণতা ও প্রশাসনিক দূরদর্শিতা দরকার ছিল, নির্বাচন কমিশন তা দেখাতে পারেনি।

এই পর্বের পর ছিল অ্যাড জুডিকেশন। এই পর্বেও নির্বাচন কমিশন সীমাহীন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের একের পর এক বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপের জন্যই জল বারবার গড়িয়েছে আদালতে। আদালতকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। এতেও জটিলতা বেড়েছে। প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার লিস্টের বাইরেই থেকে গেল। এঁদের অধিকাংশই বৈধ ভোটার। কিন্তু তারপরও তাঁরা ভোটদান থেকে বঞ্চিত হলেন। একদিকে এই বৈধ নাগরিকদের প্রতি চরম বঞ্চনা, অন্যদিকে এই বিরাট সংখ্যক মানুষ ভোট গ্রহণে অংশ নিতে না পারায় অনেক কেন্দ্রেই ফলাফল প্রভাবিত হবে। নির্বাচন কমিশন আগে সতর্ক থাকলে এমন পরিস্থিতি এড়ানো যেত। রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দল বিভ্রান্তি ছড়ানোর বদলে আরও একটু দায়িত্বশীল হলে হয়তো এত মানুষকে ভোট দানের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হত না। এই দায় যতটা নির্বাচন কমিশনের, ততটাই শাসক ও বিরোধীর।

অতীতে নানা ব্যর্থতায় নির্বাচন কমিশনের অনেক সমালোচনা হয়েছে। সেই সমালোচনা তাঁদের প্রাপ্যও ছিল। কিন্তু তারপরও ভোট গ্রহণের পর মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে, এই রাউন্ডে তাঁরা যথেষ্ট সফল। শেষ বেলায় এসে অন্তত এই ধন্যবাদটুকু তাঁদের প্রাপ্য।

সরল বিশ্বাস

দেওয়াল লেখা ও একটি মজার কাহিনি

ভোটের বাজনা আগেই বেজে গেছে। দেওয়াল লিখন পর্ব আগেই শুরু হয়ে গেছে। অনেক দল আগে থেকেই দেওয়াল বুকিং করে রাখে। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হলেই লিখে ফেলা হয়। আবার অনেক দল আগাম প্রতীক এঁকে রাখে। এই চিহ্নে ভোট দিন, এই জাতীয় আবেদনও লেখাই থাকে। শুধু প্রার্থীর নাম ফাঁকা থাকে। পরে সময়মতো সেটা লিখে দেওয়া হয়।

আমার ছোটবেলার একটি গল্প লিখতে খুব ইচ্ছে করছে। আমার পরিবার ছিল বাম ঘরানার। ছোট থেকেই দেখতাম, দেওয়ালে কাস্তে হাতুড়ি আঁকতে। আমি তখন ক্লাস ওয়ান বা টু-তে পড়ি। আমারও ইচ্ছে হল দেওয়াল লেখার। কয়েকদিন আগেই বাড়িতে রঙ হয়েছে। কিছু রঙ বেঁচে ছিল। সেটা ভাল করে গুললাম। তুলিও ছিল। রঙ, তুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পাড়াতেই চুন দেওয়া একটা সুন্দর দেওয়াল ছিল। আহা, এত সুন্দর সাদা দেওয়াল! এখানে একটা কাস্তে হাতুড়ি আঁকাই যায়।

আমি আমার মতো করে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া একটা কাস্তে হাতুড়ি আঁকছি। এমন সময় পেছনে এসে দাঁড়ালেন আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার। তিনি ছিলেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা। তিনিই নাকি দেওয়ালে চুনকাম করিয়ে রেখেছিলেন, সেই দেওয়ালে কংগ্রেসের প্রতীক আঁকাবেন বলে। সেই বয়সে আমি ওসব থোড়াই বুঝতাম! আমি

ভাবলাম, আমি এইভাবে কাস্তে হাতুড়ি আঁকছি দেখে হেডস্যার বোধ হয় খুব খুশি হয়েছেন। আমি দ্বিগুণ উৎসাহে আরেকটা কাস্তে হাতুড়ি এঁকে দিলাম। উনি কী বলবেন, ভেবেও পাচ্ছেন না।

এদিকে, আমার কাকু দূর থেকে গোটা বিষয়টা দেখছেন। আমার সেই কাকুও হেড স্যারের ছাত্র। তিনিও বাক্‌রুদ্ধ। আমি কিনা হেড স্যারের সামনে কাস্তে হাতুড়ি আঁকছি! কাকু তো আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। বলল, 'পড়াশোনা নেই, এইসব করে বেড়াচ্ছিস!'

তারপর হেড স্যারের কাছে হাতজোড় করে বলল, 'স্যার, ছোট ছেলে বুঝতে পারেনি। ক্ষমা করে দিন। আমি আবার চুন দিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছি।' অন্য কেউ তাঁর রঙ করা দেওয়ালে এমন ছবি আঁকছে দেখলে স্যার নিশ্চিতভাবেই ক্ষেপে যেতেন। কিন্তু সেদিন হেডস্যার এতটুকুও রাগলেন না। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। কাকুকে বললেন, 'ছোট ছেলে একটা দেওয়ালে এঁকেছে, কী হয়েছে! ওকে বকিস না। ও কী আর এসব সিপিএম, কংগ্রেস বোঝে! আর এই দেওয়াল মোছারও দরকার নেই। ছোট ছেলে এঁকেছে, থাক। মুছে দিলে ওর খারাপ লাগবে।'

তখন সত্যিই এত কিছু বুঝতাম না। কত দেওয়ালে এমন প্রতীক এঁকেছি। সেই হেড স্যার আজ আর বেঁচে নেই। সত্যিই, তখন পরিবেশটাই অন্যরকম ছিল। ছাত্র তাঁর রঙ করা দেওয়ালে অন্য দলের প্রতীক আঁকছে দেখেও তিনি বাধা দেননি। বরং, মুগ্ধ হয়ে এই ছেলেমানুষি দেখেছেন। এমনকী পরেও সেই প্রতীক মুছে ফেলেননি। সেই মানুষগুলোই আর হারিয়ে গেছেন। তাই সেই সহিষ্ণুতাও আর খুঁজে পাই না। সেদিনের রাজনীতি আর এদিনের রাজনীতি— ফারাক অনেকটাই।

বাঙালি এখনও এতটা সাবালক হয়নি

সরল বিশ্বাস

যিনি যে বৃত্তে বসবাস করেন, তিনি সেই বৃত্ত নিয়েই চিন্তিত। তাঁর বন্ধুমহল সেই বৃত্তের অন্তর্গত। যেমন বাম মহলে গত কয়েক মাস ধরে বারবার ঘোরাফেরা করেছে একটি প্রশ্ন, এবার কতগুলো আসন হবে? তবে প্রশ্নের ধরন গুলো একটু ভিন্ন। যাঁরা সংশয়ী, তাঁদের প্রশ্ন, এবার শূন্য কাটবে তো? আবার যাঁরা অতিরিক্ত আশাবাদী, তাঁরা তো পারলে সরকারই গড়ে দেন।

ঘুরেফিরে কয়েকটি নাম ভেসে উঠছে। অবশ্যই সামনের সারিতে মীনাক্ষী মুখার্জি। উঠে আসছে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, দীপ্সিতা ধর, কলতান দাশগুপ্ত, সায়নদীপ মিত্র দের কথা। জেলার প্রার্থীদের নাম সেভাবে উঠে আসছে না। বড়জোর কেন্দ্র হিসেবে

কেউ কেউ ডোমকল বা করণদিঘির কথা বলছেন। ফেসবুকের বিভিন্ন বামমনস্ক গ্রুপে এমন এমন কেন্দ্রের নাম ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেগুলিতে জেতা তো দূরের কথা, এমনকি দ্বিতীয় হওয়া অনেক দূরের কথা, অনেকটা পিছিয়ে তৃতীয় হওয়াই ভবিতব্য।

কলকাতা বা সংলগ্ন এলাকার প্রার্থীদের নিয়ে প্রচার একটু বেশি হবে সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, বাংলার মূল স্রোত মিডিয়া অনেকটাই কলকাতা কেন্দ্রিক। মিডিয়ার মাথায় যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা কলকাতার চোখ দিয়ে এই গোটা বাংলাকে দেখতে চান।

অনেকে আক্ষেপ করে বলেন, রাজনীতিতে শিক্ষিত লোকেরা আসছে না। কেউ অনুযোগ করেন, রাজনীতিতে তরুণরা সেভাবে উঠে আসছে না। এসব কথাগুলো বলতে হয়, তাই বলা। অন্তত বামেদের প্রার্থী তালিকার দিকে তাকালে শিক্ষিত, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির উজ্জ্বল তরুণ মুখের তো অভাব নেই। কিন্তু তারপরেও মানুষ তাঁদের ভোট দেবেন না। সেই পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আঙটি পরা, কলেজের গন্ডিতে পা না দেওয়া এলাকার তোলাবাজ হিসেবে চিহ্নিত লোকটিকেই দেবেন। নইলে, রামের মায়ের নাম জানে না, অথচ জয় শ্রীরাম চিৎকার করে চলেছে, এমন কাউকে দেবেন।

কোনও সন্দেহ নেই এবারের নির্বাচনে বামেরা যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে, যোগ্যতার নিরিখে এই প্রার্থীরা নিজের নিজের এলাকায় সবার থেকে এগিয়ে। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, ভোটের বাইনারি অনেক আগেই নির্ধারিত হয়ে

আছে। ২০১৯ থেকে শুরু হয়েছে এই বাইনারি। প্রায় সব কেন্দ্রেই লড়াই তৃণমূল বনাম বিজেপি, এই ছবিটাই তুলে ধরছে মূল স্রোত মিডিয়া। আপনি মানুন আর নাই মানুন, অধিকাংশ আসনে এই বাইনারিই হল নির্মম বাস্তবতা। সেই বাইনারির পেছনে রয়েছে ধর্মীয় মেরুকরণও। কাজের নিরিখে যদি তৃণমূল বনাম বিজেপির লড়াই হত, তাহলে তেমন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু দুই শিবিরের লড়াইয়ে কাজের কথা, কর্মসংস্থানের কথা বা দুর্নীতির কথা একেবারেই উঠে আসছে না। ঘুরেফিরে সেই হিন্দু বনাম মুসলিম, এই আবহই টেনে আনা হচ্ছে। ভোটের বাইনারি যখন এমন নির্লজ্জ বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, সেখানে প্রগতিশীলদের লড়াইটা একটু কঠিন হয়ে যায়।

তাই সহজ কথাটা সহজে বলাই ভাল। আসন জয়ের নিরিখে এবারও তেমন সম্ভাবনা নেই। শূন্য দশা নিশ্চিতভাবেই কাটবে। কিন্তু বামেদের আসন কি পাঁচ অতিক্রম করবে? এমন সম্ভাবনা সত্যিই দেখা যাচ্ছে না। যে কটি আসন আসবে, তা হয়তো মালদা বা মুর্শিদাবাদ থেকেই। কলকাতা বা সংলগ্ন এলাকার প্রার্থীরা, যতই যোগ্য হোন, যতই তাদের নিয়ে ফেসবুক আন্দোলিত হোক, যতই তাদেরকে ঘিরে উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখা হোক, জয়ের পথটা বড়ই কন্টকাকীর্ণ। কোনও সন্দেহ নেই যাদবপুরে বিকাশ ভট্টাচার্যই যোগ্যতম প্রার্থী। তাঁর একশো মাইলের মধ্যেও নেই তৃণমূল বা বিজেপির প্রার্থী। কিন্তু তারপরও তিনি জিতবেন, এমনটা জোর দিয়ে বলার উপায় নেই। ঠিক তেমনই, গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে উত্তরপাড়ায় মীনাক্ষীর একশো মাইলের মধ্যে অন্যরা নেই। তারপরও যাঁরা ভোট দেবেন, তাঁরা সেই হিন্দু বনাম মুসলিম আবর্তে ঘুরপাক খাবেন।

মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে শেখে। মানুষ ঠকে শেখে। কিন্তু বাঙালির চিন্তা চেতনার মান এমন স্তরে নেমে এসেছে, তাঁরা ভোটের বাক্সে বিরাট কিছু বিপ্লব এনে দেবেন, এমন আশা করাটা কিছুটা দুরাশারই শামিল। তাই আঙ্গুর ফল টকের মত শোনালেও, বলতেই হচ্ছে, এখনই বামেরা জিতবেন, বাঙালি এখনও এতখানি পরিণত হয়নি। যে বাঙালি সারাক্ষণ হিন্দু বনাম মুসলিম তর্কে মেতে থাকে, তৃণমূল বা বিজেপিই তাঁদের ভবিতব্য। বামেদের শাসক হিসেবে পাওয়ার মতো যোগ্যতা বাঙালি এখনও অর্জন করেনি।

মিডিয়া সমাচার

বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন এ জমি লইব কিনে

সৃজন শীল

খুব ছোটবেলার কিছু মুখ চিরতরে মনে দাগ কেটে যায়। তেমনই একটি মুখ প্রণয় রায়। মনে আছে, আটের দশকে দূরদর্শনে শুক্রবার রাতে একটি অনুষ্ঠান হত, 'দ্য ওয়ার্ল্ড দিস উইক'। পুরো অনুষ্ঠানটাই ইংরাজিতে। ওই সময় কিছুই বুঝতাম না। তবু কেন জানি না, টিভির সামনে বসে পড়তাম। দেশ-বিদেশের নানা ছবি। ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ নাইবা বুঝলাম, ছবিগুলোই মনের মধ্যে একটা খুশির তুফান এনে দিত। সেই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন প্রণয় রায়। কিশোর মনে সেই মুখটাই ছাপ ফেলে গিয়েছিল।

তারপর প্রণয় রায়কে পেলাম অন্য ভূমিকায়। বুঝলাম, ভোট বিশ্লেষণে ইনি দেশের প্রথমসারির বিশেষজ্ঞদের একজন। শুরু হল এনডিটিভি। টেলিভিশন সাংবাদিকতার দুনিয়ায় এল নতুন এক বাঁক। তাঁর হাত ধরে উঠে এলেন একঝাঁক নতুন মুখ। তাঁদের অনেকেই আজ সারাদেশে

পরিচিত মুখ। এবারের বাংলার ভোটে সেই প্রণয় রায়কে পেলাম একেবারেই অন্য ভূমিকায়। এক হাতে একটি ব্যুম, অন্যহাতে মোবাইল। রাস্তায় ভিড়ের মাঝে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। একটা সময় তাঁর স্টুডিওতে ডাক পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেন দেশের প্রথমসারির নেতামন্ত্রীরা। আজ তিনি কিনা চড়া রোদে ব্যুম হাতে ভিড়ের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

একই সঙ্গে খারাপ লাগল, আবার একইসঙ্গে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল। মোদিবাবু হলেন 'দুই বিঘা জমি'র সেই জমিদারের মতো, যাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বাবু কহিলেন বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।' একের পর এক চ্যানেল তাঁর দুই পেটোয়া ব্যবসায়ী চালাচ্ছেন। স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর হয়ে বেঁচেবর্তে ছিল এনডিটিভি। অতএব, তাঁকেও বাগে আনতে হবে। এদিকে এনডিটিভির সেই পুরনো টিমও ততদিনে ভেঙে গেছে। যে যাঁর মতো করে বিভিন্ন চ্যানেলের মাথায় বসে গিয়েছেন। প্রণয় রায়ের অবস্থা তখন সেই উপেনের মতোই। জমিদার তাঁর ওই সাধের দুই বিঘা জমি কিনে নিতে চান।

গ্রামের জমিদার আর রাষ্ট্রের মধ্যে তেমন ফারাক নেই। রাষ্ট্র চাইলে কি না পারে! তাঁর হাতে যেমন বশংবদ মিডিয়া, তেমনই তাঁর হাতে সিবিআই, ইডি, ইনকাম ট্যাক্স— আরও কত কী! দাও লেলিয়ে। তাই হল, প্রণয় রায়কে কার্যত বাধ্য হয়েই এনডিটিভির মালিকানা ছাড়তে হল। এই ছিয়াত্তর বছর বয়সে একা একা কীই বা করতে পারতেন? তাঁর যে খুব অর্থের অভাব, এমন নয়। ড্রয়িংরুমে বসে টিভি দেখে, ফোন ঘেঁটে বা দেশ বিদেশ ঘুরে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু প্যাশন কাকে বলে, সেটা বুঝিয়ে দিলেন। এই ছিয়াত্তর বছর বয়সেও নেমে পড়লেন জনপথে। মাঠে নেমে বুঝতে চাইলেন জনতার নাড়ির স্পন্দন। একসময় কোন আসেন ছিলাম, এখন কোথায় আছি— এই জাতীয় যাবতীয় হীনমন্যতাকে ঝেড়ে ফেলে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, তিনি আজও সাংবাদিক। বুঝিয়ে দিলেন, 'যদি ভাবো কিনছ আমায় ভুল ভেবেছ।'

যতই মঞ্চ কেড়ে নেওয়া হোক, যতই মাইক কেড়ে নেওয়া হোক, তিনি তাঁর মতো করেই তাঁর কণ্ঠস্বরকে পৌঁছে দিচ্ছেন আমজনতার কাছে। এই কণ্ঠ রাষ্ট্রের চোখরাঙানিকে পরোয়া করে না। প্রণয় রায়, কয়েকটা ছবি, কয়েকটা মুহূর্ত আমাদের কতকিছু শিখিয়ে দিয়ে গেল! এভাবেই মাথা উঁচু করে থাকুন। আমাদের কুর্নিশ গ্রহণ করুন।

হাওয়াই শেষ সত্য নয়

সৃজন শীল

সময়টা ঠিক পাঁচ বছর আগে। প্রায় সকলে ধরেই নিয়েছিলেন, রাজ্যে এবার বিজেপির সরকার হচ্ছে। অবকি বার দুশো পার, এমন স্লোগান শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষক থেকে পাড়ার পল্টুদা, সবাই যেন একই সুরে কথা বলছিলেন। এমনকি তৃণমূল নেতৃত্বের চোখমুখও ছিল থমথমে। তাঁরাও বোধহয় ধরে নিয়েছিলেন, এবার সরকার উল্টে যাচ্ছে। বিভিন্ন এক্সিট পোলে এগিয়ে রাখা হচ্ছিল বিজেপিকেই। সেখানে ২০০ বেশি আসন হয়তো দেখানো হয়নি, কিন্তু সরকার যে হচ্ছে এমন ইঙ্গিত ছিল।

একমাত্র প্রশান্ত কিশোর। যিনি জোর গলায় বলেছিলেন, বিজেপি কোনওভাবেই তিন অঙ্কে পৌঁছতে পারবে না। যদি বিজেপি তিন অঙ্কে পৌঁছে যায়, তবে তিনি আর ভোট কুশলী থাকবেন না। এই পেশা থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নেবেন। তখন অনেকেই ভেবেছিলেন, প্রশান্ত কিশোর হয়তো গণনার আগে তৃণমূল কর্মীদের উজ্জীবিত করার জন্যই এমনটা বলেছিলেন। কিন্তু ভোটের ফল বেরোতেই দেখা গেল, বিজেপি সত্যিই দু অঙ্কেই আটকে গেল। সর্বসাকুল্যে আসন গিয়ে দাঁড়ালো ৭৭। এত বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা আসতে পারে, খোদ তৃণমূল নেতৃত্ব সম্ভবত ভাবতে পারেননি।

বামেরা যখন দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতায়, তখন মাঝে মাঝেই প্রশ্ন উঠতো, সিপিএম কি সত্যিই এতখানি গ্রহণযোগ্য? এক বিখ্যাত সাংবাদিক প্রায়ই বলতেন এবং লিখতেন, বামেরা যতখানি গ্রহণযোগ্য, তৃণমূল তার থেকে অনেক বেশি বর্জন যোগ্য। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের পরেও হয়তো এই প্রশ্নটাই প্রাসঙ্গিক ছিল। তৃণমূল যত না গ্রহণযোগ্য, তার থেকে অনেক বেশি বর্জনযোগ্য ছিল বিজেপি। কারণ নির্বাচনের আগে তারা শুধু হুংকারই দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভোটে জেতার জন্য যা যা উপাদান লাগে, তার অধিকাংশই তাদের সঙ্গে ছিল না। টাকার জোর হয়তো ছিল, কিন্তু নিচু তলায় সংগঠন বলে তেমন কিছুই ছিল না। প্রার্থী নির্বাচন ছিল একেবারেই ত্রুটিপূর্ণ। অর্ধেকের বেশি আসনে প্রার্থী করা হয়েছিল তৃণমূল থেকে আসা নেতাদের। স্থানীয় স্তরে যাদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ, তারাই কিনা এসে প্রার্থী হয়ে গেলেন বিজেপির হয়ে। ফলে প্রত্যাখ্যানই ছিল তাদের ভবিতব্য।

কোনও সন্দেহ নেই, অতীতের ভুল থেকে বিজেপি অনেকটাই শিক্ষা নিয়েছে। তৃণমূলে টিকিট না পেয়ে যাঁদের দম বন্ধ হয়ে আসছিল, তাঁদের জন্য অন্তত রেড কার্পেট পাতা ছিল না। বরং দরজাটা বন্ধই ছিল। এটা যদি একটা ইতিবাচক দিক হয়ে থাকে, তবে সিবিআই ও ইডির ধারাবাহিক ব্যর্থতা ছিল মস্ত এক নেতিবাচক দিক। কয়লা, বালি, গরু, সারদা, নারদা, চাকরি দুর্নীতি, আরজিকর- এমন নানা বিষয়ে তদন্তের সরাসরি দায়িত্ব ছিল সিবিআই ও ইডির হাতে। মাথা পর্যন্ত পৌঁছানো তো দূরের কথা, এই দুই তদন্তকারী সংস্থা হাটু পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। সত্যিই কি তারা তদন্তের কিনারা করতে পারেনি? নাকি করতে চায়নি?

ভোটের আগে নতুন করে যোগ হল এস আই আর। এখানেও বিজেপি নেতৃত্ব শুরু থেকেই হুংকার ছাড়লেন, এক কোটি রোহিঙ্গার নাম নাকি ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে। এখানেও কার্যত পর্বতের মূষিক প্রসব। কিছু মৃত

ভোটার, কিছু স্থানান্তরিত ভোটারের নাম বাদ গেল ঠিকই, কিন্তু তার জন্য যে হুংকার ছাড়া হয়েছিল, তা বুমেরাং হয়ে গেল। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্স এর নামে ভোগান্তির চূড়ান্ত। সংখ্যালঘু নাম যেমন বাদ পড়ল, তেমনি বিরাট সংখ্যক হিন্দুর নামও বাদ গেল। বিজেপি নেতৃত্ব ভেবেছিলেন, বাকি সব ইসুকে দূরে সরিয়ে রেখে শুধু এস আই আর আর হিন্দু-মুসলিম করেই ভোটের বাজার গরম করবেন।

গ্রাম থেকে শহর, সর্বত্রই একটা হাওয়া উঠেছিল এটা ঘটনা। ভোটের বড় চালিকা শক্তিকে হাওয়া, এনিয়েও তেমন সংশয় নেই। কিন্তু শুধু হাওয়া দিয়ে ভোটে জেতা যায় না। যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, তা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য, সেটাও দেখা দরকার। যেমন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে বসলেন, ক্ষমতায় এলে সব মহিলাকে তিন হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী যা যা ঘোষণা করেছিলেন, তার কতটুকুই বা বাস্তবায়িত হয়েছে? প্রায় কুড়িটি রাজ্যে বিজেপির সরকার চলছে। কোন রাজ্যে মহিলাদের তিন হাজার করে ভাতা দেওয়া হয়? কেউ কেউ বিশ্বাস করেছেন ঠিকই, অনেকে বিশ্বাস করেননি এটাও ঘটনা।

তাহলে ভোটের ফল কী হবে? রাস্তায় বাসে মেট্রো বা অটোয় চড়লে মনে হবে এই সরকারের পতন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু বাস্তবের অঙ্ক একটু হলেও ভিন্নতর। তৃণমূলের আসল ভোট ব্যাঙ্ক সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণাই নেই। বিগত নির্বাচনগুলিতে যাঁরা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের কজনকে আমরা ঠিকঠাক চিনি? তাঁদের কজনের সঙ্গে আমরা উপযুক্ত সম্মান দিয়ে দুদন্ড গল্প করেছি? কখনও তাঁরা সংখ্যালঘু বলে উন্নাসিকতায় নাক সিটকেছি। কখনও আবার গ্রাম-গঞ্জের মহিলাদের ভিখারি বলে কটাক্ষ করেছি।

এবারও এক্সিট পোল যাই বলুক, বাস্তবের মাটির গন্ধ চিনতে হয়তো কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। টিভি চ্যানেল বা ফেসবুক দেখে আমরা যতই উল্লাসিত হই, যারা তৃণমূলকে অক্সিজেন দিয়ে টিকিয়ে রেখেছেন, তাঁরা এই ফেসবুকের বৃত্তের অনেক বাইরে। তাঁদের জীবনের স্পন্দন থেকে আমরাও অনেক দূরে।

যেমন মোদি, তেমন তাঁর গ্যারান্টি

রক্তিম মিত্র

নির্বাচন এলেই প্রধানমন্ত্রী ঘনঘন বাংলায় আসেন। নিজের দলের হয়ে প্রচারে আসতেই পারেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি ভুলে যান তিনি এই দেশের প্রধানমন্ত্রী। এই রাজ্যের উন্নয়নে তাঁরও কিছু দায় আছে। সব দায় ঝেড়ে ফেলে অন্যদের ওপর চাপানোতেই তিনি বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এক দশকের বেশি সময় ধরে রাজ্যের নানা অনাচারের কথা তুলে ধরেন। তারপরই বলেন, সবকিছুর হিসেব হবে। বছরের পর বছর পেরিয়ে যায়। তাঁর সিবিআই, তাঁর ইডি কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে থাকে। গরু, কয়লা থেকে শুরু করে শিক্ষা দুর্নীতি, আর জি কর— কত প্রসঙ্গই না তাঁর ভাষণে উঠে আসে। সবগুলিরই তদন্তের দায়িত্বে সিবিআই। কোনওটারই কিনারা করা তো দূরের কথা। একের পর এক অভিযুক্তরা দিব্যি ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার ভোটেও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ইডির কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ফাইল ছিনতাই করে নিয়ে চলে গেলেন। ইডি দন্ত বিগলিত করে দেখল। প্রধানমন্ত্রী অনেক হুঙ্কার দিয়েছেন। বেশ কয়েক মাস পেরিয়েও গেছে।

ইডি শুধু আদালতে তারিখের পর তারিখ চেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এমন অকর্মণ্য সিবিআই, এমন অকর্মন্য ইডির মাথায় প্রধানমন্ত্রী। তিনি যখন হুঙ্কার দেন, আসলে নিজের গালেই কষে থাপ্পড় মারেন।

কথায় কথায় তিনি বলেন, 'ইয়ে মোদি সরকার কী গ্যারান্টি হ্যায়।' এই বাক্যটা শুনলেই কেমন যেন লাগে। নিজের মুখে নিজেই বলছেন 'মোদি সরকার'। এনডিএ সরকার নয়, বিজেপি সরকার নয়, একেবারে 'মোদি সরকার'। এর আগে কোনও প্রধানমন্ত্রীকে এমন নির্লজ্জভাবে নিজের নামে প্রচার করতে শোনা যায়নি।

এত গ্যারান্টি তো দিচ্ছেন। কোন গ্যারান্টি তিনি পালন করেছেন? বছরে দু'কোটি চাকরি তো তাঁরই গ্যারান্টি ছিল। সেই গ্যারান্টির কী হল? বারো বছরে ২৪ কোটি চাকরি হওয়ার কথা। ২৪ লাখ হলেও বলা যেত এক শতাংশ হয়েছে। কিন্তু সেটুকুও হয়নি। বলেছিলেন, সব কালো টাকা দেশে ফেরত আনবেন। শুধু বলেই থেমে যাননি। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সিট গঠন করেছিলেন। এক টাকাও ফেরত এসেছে? একশো স্মার্ট সিটির ঘোষণাও কার্যত প্রহসনের শামিল। এরপর তিনি কোন মুখে গ্যারান্টির কথা বলেন?

চাকরি দুর্নীতির তদন্ত কে করছে? তাঁর সিবিআই। এত বছর পেরিয়ে গেল। দু একটা চুনোপুঁটি ধরা ছাড়া আর কী কাজ হয়েছে? প্রায় আশি শতাংশ টাকা যাঁর কাছে জমা পড়েছে, তাঁকে স্পর্শ করতে পেরেছেন? কোনও এক দুর্বৃত্ত ইডি-র জেরা থেকে বেরিয়ে এসে দেড় ঘণ্টা ভাষণ দেন। এত সাহস হয় কী করে? হয়, কারণ তিনি জানেন, সিবিআই বা ইডি তাঁর 'কাঁচকলা' করবে। আর জি কর কাণ্ডের তদন্ত। ঘটনার তিন-চার দিনের মধ্যেই সিবিআই-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কী অশ্বডিম্ব প্রসব করল আপনার সিবিআই? এতদিন পরে বলছেন, পুলিশ প্রমাণ লোপাট করেছে। এসব বলতে একটু লজ্জাও হয় না! পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করবে না বলেই তো সিবিআই-কে তদন্তভার দেওয়া। তারপর এই ছেঁদো অজুহাত! যাঁরা প্রমাণ লোপাট করল, তাঁদের বিরুদ্ধেই বা কী ব্যবস্থা নিতে পেরেছেন? যাঁরা প্রমাণ লোপাট করেছেন, তাঁরাও জানতেন, সিবিআই কাঁচকলা করবে। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সিবিআই সেই 'কাঁচকলা'ই করেছে। এরপরেও অভয়ার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন? তাঁর মাথায় আশীর্বাদের হাত রাখছেন? যদি আত্ম সম্মান থাকত, মুখ দেখাতে পারতেন না। কিন্তু তারপরেও 'মোদির গ্যারান্টি' আমাদের শুনতে হয়।

আচ্ছা, এই রাজ্যে একটা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় করতে তাঁকে কেউ বারণ করেছিল? জেলায় জেলায় উন্নতমানের মডেল স্কুল খোলাই যেত। কটা স্কুলের উদ্যোগ নিয়েছেন? কয়েকটা উন্নতমানের হাসপাতাল করতে কেউ বাধা দিয়েছিল? রুগ্ন কলকারখানা খুলতে কেউ বারণ করেছিল? বন্ধ চা-বাগান অধিগ্রহণ করতে কেউ বারণ করেছিল? এর জন্য কোনও জমিও লাগত না। কেন্দ্রের বিভিন্ন দপ্তরের হাতে যে সব অব্যবহৃত জমি পড়ে আছে, তাতেই অন্তত পাঁচশোটি প্রকল্প হয়ে যেত। সেইসব করে তারপর না হয় গ্যারান্টি দিতেন।

তিনি না থাকলেও গ্যালারি সেই হলুদ

সোহম সেন

একেক শহরের নামে দল। অর্থাৎ, সেই দলের হয়ে চিৎকার করবেন সেই শহরের মানুষ। কিন্তু কোথায় বা কী? সব বেড়াজাল যেন একাই ভেঙে দিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

কলকাতা হোক বা দিল্লি, যেখানেই তিনি খেলতে যান, গ্যালারির রঙ হয়ে ওঠে হলুদ। ভাবা যায়, কলকাতার দর্শকেরা নাইট রাইডার্সের হয়ে গলা না ফাটিয়ে হলুদ জার্সি পরে এসে 'ধোনি-ধোনি' চিৎকার করে যাচ্ছেন! টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন ১২ বছর আগে। একদিনের ক্রিকেটে শেষ খেলেছেন, তাও সাত বছর আগে। বয়স ৪৪ বছর।

কিন্তু এখনও তাঁকে ঠিক 'প্রাক্তন' বলা যাবে না। আইপিএলের আঙিনায় এখনও সবথেকে বেশি মাতামাতি যাঁকে ঘিরে, তিনি এম এস ধোনি।

তাঁর ঘরের মাঠ বলে কিছু নেই। যেখানে তিনি খেলতে যান, সেটাই তাঁর ঘরের মাঠ। সেখানেই গ্যালারির রঙ হয়ে ওঠে হলুদ। সবার গায়েই উঠে আসে সাত নম্বর জার্সি।

ধরা যাক, ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংসের ম্যাচ। অজিঙ্কা রাহানের নাম লেখা জার্সি পরে যত লোক মাঠে আসবেন, তার থেকে অনেক বেশি দর্শক আসবেন ধোনির নাম লেখা জার্সি পরে। নাইট শিবিরের কেউ চার বা ছয় মারলে গ্যালারি যত না উত্তাল হবে, ধোনি চার বা ছয় মারলে গ্যালারি অনেক বেশি উত্তাল হবে।

কিন্তু ধোনির নামে এই উন্মাদনা কেন? কারণ, আর দশজনের থেকে তিনি অনেকটাই আলাদা। তাঁকে অহরহ নিজের ঢাক নিজেকে পেটাতে হয় না। তাঁকে প্রতিনিয়ত টুইটার বা ইনস্টাগ্রামে ভেসে থাকতে হয় না। সবসবময় হ্যাংলার মতো ছবি পোস্ট করে নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখতে হয় না। একটা ম্যাচে রান পেলেই প্রাক্তনদের উদ্দেশে কুৎসিত আক্রমণ করতে হয় না। তিনি জানেন, কীভাবে নিজেকে প্রচারের আলোর আড়ালে রাখতে হয়। তিনি নিঃশব্দে টেস্ট থেকে অবসর নিতে পারেন। তিনি নিঃশব্দে সাদা বলের ক্রিকেটের নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে পারেন। তাঁর কোনও ফেয়ারওয়েল ম্যাচ লাগে না। তাঁকে লম্বা চওড়া ভাষণও দিতে হয় না। তিনি মাসের পর মাস সেনা বাহিনির ব্যারাকে প্রশিক্ষণ নেন। কেউ জানতেও পারে না। অহরহ ছবি ছেড়ে সেটাকে ইভেন্ট বানাতে চান না।

গোটা গ্যালারি তাঁকে দেখার জন্য উন্মুখ। তাঁর জন্যই গ্যালারি রেঙে উঠেছে হলুদ রঙে। অথচ, তিনি কিনা ব্যাট করতে নামছেন সেই আট নম্বরে। কোনও ম্যাচে সুযোগ পাচ্ছেন এক ওভার। কোনও ম্যাচে এক বা দুই বল। অথচ, চাইলেই তিনি তিনে বা চারে আসতে পারতেন। ব্যাট হাতে ঝড় তুলতে পারতেন। সর্বোচ্চ রানের তালিকায় প্রথম তিন–চারের মধ্যেই থাকত তাঁর নাম। যদি একদিনের ক্রিকেটে সাত নম্বরে না নামতেন, নামের পাশে হয়ত তিরিশ খানা সেঞ্চুরি থাকত। কিন্তু হেলায় সেসব ছাড়তে পারেন। টেস্ট ছেড়েছেন সেই ২০১৪তে। আর যদি এক বছর খেলতেন, একশো টেস্টের মাইলস্টোনে পৌঁছে যেতেন। হাসতে হাসতে সেইসব প্রলোভনকে উপেক্ষা করতে পারেন।

এইসব ত্যাগের কথা রেকর্ড বইয়ে থাকে না। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি দৌড়ে কোথাও একটা সেই মানুষটাকে এগিয়ে দেয়। তাই যাঁদের নামের পাশে একশো টেস্ট বা দশ হাজার রান আছে, দিনের শেষে সেই মানুষগুলোকেও কোথাও একটা ছোট মনে হয় এই মহামানবের কাছে।

কে বলল আইপিএলে আবেগ নেই? অন্তত ধোনির মতো তারকাকে ঘিরে উন্মাদনা বারবার বুঝিয়ে দিয়েছে, আইপিএল যথার্থ গুণীর কদর করতে জানে। সে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে জানে। এবার ধোনি কটা ম্যাচ খেলবেন, জানি না। খেললেও কত নম্বরে ব্যাট করবেন, আদৌ ব্যাট করতে পাবেন কিনা, জানা নেই। তবু সব তরুণকে পিছনে ফেলে তিনিই যেন হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা।

১ মে, ২০২৬

ভরসার ভোট

bengaltimes.in

ISSN 2445 5657